আমাদেরসময়

তারিখ .. 23. OCT. 2015 ...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম.... ২.....

ড. মো. শরিফ উদ্দিন

শিক্ষা ও সাম্প্রতিক আন্দোলন প্রসঙ্গ

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের চলমান আন্দোলন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের পর আন্দোলনরত শিক্ষকদের মধ্যে হতাশার ছায়া কিছুটা হলেও দেখা গেছে, বিভিন্নভাবে শিক্ষকরা এই বক্তব্যকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, বিশেষ করে যারা আমাদের এই আন্দোলনে সামনের সারিতে রয়েছেন। অন্যদিকে যেসব শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে জড়িত তারা বিবৃতি দিয়ে নিজেদের অবস্থান জানিয়েছেন, কেউ বেশ শক্তভাবে, কেউ মোলায়েম ভঙ্গিতে, কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিবৃতিগুলো এসেছে রাজনৈতিকভাবে। যেমন বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেসব সরকারদলীয় শিক্ষক রয়েছেন তারা যা বলতে চেয়েছেন তার সার হলো, প্রধানমন্ত্রীকে আমলারা বিভ্রান্ত করেছেন বলেই মূলত তিনি এমন কথা বলেছেন এবং আমরা যে আন্দোলনে রয়েছি সেটি সাধারণ অর্থে কোনো আর্থিক সুবিধাদি আদায়ের আন্দোলন নয়, বরং আন্দোলনটি মর্যাদা রক্ষার। অন্যদিকে যারা বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরে রয়েছেন তারা বলছেন, প্রধানমন্ত্রী মূলত তার এই বক্তব্যের মাধ্যমে গোটা শিক্ষক জাতিকেই খাটো করেছেন, আন্দোলনকে ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা না করে বরং কর্তৃপক্ষের উচিত শিক্ষকদের জীবনমান উন্নয়ন এবং মর্যাদার প্রশ্নটিকে আমলে নেওয়া। প্রকৃতপক্ষে সবাই যে কথাটি সমস্বরে বলেছেন সেটি হলো, শিক্ষকদের মর্যাদা।

> আমাদের সমাজে যে আন্দোলনটি আশু গড়ে ওঠা উচিত সেটি হলো শিক্ষা বাজেট বৃদ্ধির আন্দোলন, শিক্ষা-গবেষণা এবং অবকাঠামো উন্নয়নে বরাদ্দ বৃদ্ধি না করলে দিন-দিন হয়তো এমন আরও আন্দোলনের আশঙ্কা নাকচ করা যায় না। শুধু শিক্ষকদের সঙ্গে বড় বড় কথা বলে, শিক্ষায় ভ্যাট বাড়িয়ে কখনো সুফল আসবে না, এটি বরং বিবেকবান মানুষের হাসির খোরাক জোগাবে

আন্দোলনের উৎসমুখ হলো, যখন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন অষ্টম বেতন কাঠামো এবং চাকরি কমিশনের প্রতিবেদনে বেতন কাঠামোর সুপারিশ করেন এরই পরিপ্রেক্ষিতে সচিব কমিটির প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ-হতাশা নেমে আসে। অষ্টম কমিশনের সুপারিশও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কাছে অনেকাংশে সন্তোষজনক না হলেও আগের নিয়ম অনুযায়ী তারা কেউ কেউ মেনে নিয়েছিলেন। অথচ সচিব কমিটির প্রস্তাব গোটা শিক্ষক সমাজকে শুধু অসম্মানই করেনি, বরং তাদের মর্যাদার প্রশ্নেও ধৃষ্টতা দেখিয়েছে।

শিক্ষকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠের পরিবেশ বজায় রেখেই নিজেদের দাবির কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। অথচ এগুলোতে কোনো কাজ হয়নি, শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই শিক্ষকদের আন্দোলনে নেমে আসতে হয়েছে এবং শিক্ষকরা এখন তাদের দাবি আদায়ের প্রশ্নে চূড়ান্ত আন্দোলনের কথাই ভাবছেন বলে আমি মনে করি এবং

সংবাদপত্রের মাধ্যমেও বিষয়টি জানা যায়।

এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার বিষয় যে, আমাদের দেশে বিভিন্ন সময় শিক্ষকদের আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায় করে নিতে দেখা যায় সেই হিসেবে এটি একটি সাধারণ ঘটনাও। কখনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সুদূর গ্রাম থেকে ছুটে আসতে হয় রাজধানী ঢাকায়, এতে কখনো দাবি আদায় হয়, কখনো জলকামান কিংবা পিপার স্প্রের যন্ত্রণায় প্রাণ দিতে হয় মানুষ গড়ার এই কারিগরদের। তবু তারা ঢাকায় আসেন, শহীদ মিনারে জড়ো হন, শাহবাগে জড়ো হন– তারা জানেন এমন অশিষ্ট আচরণ তাদের সইতে হতে পারে। প্রশ্ন হলো, তবু তারা কেন আসেন? আসেন এ জন্য যে, মানুষ গড়া ছাড়াও নিজেদের পরিবার-স্বজনদের নিয়ে বেঁচে থাকার তাদিগবোধও তাদের থাকতে হয়, এভাবে সময়ের পালাবদলের পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও আসতে হয়, এই ঢাকাতেই নিজেদের দাবি জানাতে আসেন উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষকরাও। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এবারের আন্দোলনকে দীর্ঘায়িত করতে বাধ্য করা হচ্ছে কিংবা তারা বাধ্য হচ্ছেন নিজেদের মর্যাদা রক্ষার এই লড়াইকে এগিয়ে নিতে।

প্রধানমন্ত্রী যে মন্তব্য সাম্প্রতিক সময়ে করেছেন সেটি নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। এটিকে শিক্ষকরা শুধু তাচ্ছিল্যপূর্ণ বলেই মন্তব্য করেননি, বরং প্রত্যাহারেরও আহ্বান জানিয়েছেন। প্রথিতযশা শিক্ষক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদও এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানানোর মধ্য দিয়ে কার্যত শিক্ষকদের দাবির সঙ্গে সংহতি জানিয়েছেন। এভাবে বিভিন্ন দল ও মতের উর্ধ্বে উঠে দেশের প্রগতিশীল ও উন্নত চিন্তার সব মানুষই শিক্ষকদের এই ন্যায্য দাবির সঙ্গে সহমত জানিয়েছেন, যা শিক্ষকদের জীবনের সার্বিক মানোন্নয়ন এবং মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রকৃত কারণ যদি অনুসন্ধান করা হয়, কেন আমাদের শিক্ষা-গবেষণার এই বেহাল দশা, কেন কয়েকদিন পরপর বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য শ্রেণিকক্ষ ছেড়ে রাজপথে নেমে আসতে হয়, এসব ঘটনার উৎসমূল অনুসন্ধান করা হলে যা খুঁজে পাওয়া যায় সেটি হলো– শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট স্বল্পতা অর্থাৎ শিক্ষার মতো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ খাতে কম বরাদ্দ। এটি আমাদের দেশের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা যে, এখানে শিক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তার চেয়ে তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ খাতে বেশি বরাদ্দ দিয়ে জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ চাহিদাকে অগ্রাহ্য করার মধ্য দিয়ে মূলত জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়াদিকেই অবমূল্যায়ন করা হয়।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে শিক্ষা ও প্রযুক্তির মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ খাত মিলিয়ে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয় ২৯ হাজার ৮৮৮ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ১০ দশমিক ৯ শতাংশ এবং জিডিপির ১ দশমিক ৮০ শতাংশ। অথচ প্রতিরক্ষাসহ অনেক অনুৎপাদনশীল খাতে বরাদ্দের পরিমাণ বিপুল। এখানে কৃষি, শিক্ষা, প্রযুক্তি এবং সামাজিক নিরাপত্তার মতো তাৎপর্যপূর্ণ খাতগুলোকে অবহেলিত রাখা হয়।

এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে আমাদের শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি কোনো দিনই সাধিত হবে বলে মনে হয় না। আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে এটি অনুধাবন করতে হবে যে, একটি সুশিক্ষিত প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারলেই আমাদের বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা সফলতার মুখ দেখবে, অন্যদিকে মুখে মুখে শুধু শিক্ষার মহত্ত্বগাথা গেয়ে গোপনে এর বিরুদ্ধাচরণ করলে দেশ এবং জাতি হিসেবে সামনে আমাদের বড় দুর্যোগ পোহাতে হবে। এই মুহূর্তে আমাদের সমাজে যে আন্দোলনটি আশু গড়ে ওঠা উচিত সেটি হলো শিক্ষা বাজেট বৃদ্ধির আন্দোলন, শিক্ষা-গবেষণা এবং অবকাঠামো উন্নয়নে বরাদ্দ বৃদ্ধি না করলে দিন দিন হয়তো এমন আরও আন্দোলনের আশঙ্কা নাকচ করা যায় না। শুধু শিক্ষকদের সঙ্গে বড় বড় কথা বলে, শিক্ষায় ভ্যাট বাড়িয়ে কখনো সুফল আসবে না, এটি বরং বিবেকবান মানুষের হাসির খোরাক জোগাবে।

লেখক : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্ট, রিসার্চ ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অব কমপ্লিট এডুকেশন